‘দূত সম্মেলন (Envoys Conference)’ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২৬ নভেম্বর ২০১৭, রবিবার, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারদের আজকের এই সম্মেলনে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা-সাক্ষাত হয় বটে, কিন্তু আজকে সবাইকে একসঙ্গে পেয়েছি, মত বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। এজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির গভীর সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ সময় বিদেশে দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের কাছেও বার্তা পৌঁছে যায় তাঁদের করণীয় সম্পর্কে।

কলকাতা মিশনে কর্মরত জনাব হোসেন আলী সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল বিদেশের কোন দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কূটনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন। এছাড়া দিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্কসহ আরও কয়েকটি স্থানে কূটনীতিকরা বাংলাদেশের হয়ে কূটনৈতকি তৎপরতা শুরু করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যাত্রা শুরু হয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়’’ হ’ল আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। তাঁর পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তা ও গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সফল আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় করে আনেন।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী কূটনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে এক অনন্য স্থান অধিকার করে। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করা। এর মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি এবং আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন।

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি বাংলায় ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি তথা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেন।

তিনি বিশ্ববাসীকে জানান, বাংলাদেশের স্বাধীন জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা। যার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেন অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সমতা, ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষা এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার মৌলিক নীতিসমূহ। তাঁর দূরদর্শী, দিকনির্দেশনামূলক পররাষ্ট্রনীতি আজও আমাদের বিশ্বরাজনীতিতে পথ দেখায়।

প্রিয় রাষ্ট্রদূতগণ,

বর্তমানে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। নির্যাতনের মুখে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান নিয়েছে। মানবিক কারণে আমরা তাদের প্রবেশ করতে দিয়েছি। কিন্তু এরফলে আমাদের আর্থসামজিক ব্যবস্থার উপর ব্যাপক চাপ পড়েছে।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় সারাবিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ আমাদের সাধুবাদ জানাচ্ছে এবং কিছু সহযোগিতাও করছে। রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আমরা দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমি আশাবাদী অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা তাদের ফেরত পাঠাতে পারব।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নিকট প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখা। এছাড়া, বহুপক্ষীয় সভায় বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সুরক্ষা, বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নতুন নতুন শ্রম বাজারের সন্ধান এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তির বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে সচেষ্ট ও তৎপর থাকার বিষয়টি আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

আপনারা জানেন, পররাষ্ট্রনীতিতে অভ্যন্তরীণ জাতীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে। আমাদের অভ্যন্তরীণ জাতীয় লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন।

এ সকল লক্ষ্য পূরণে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনীতি অন্যতম ভুমিকা পালন করতে পারে। এ সকল প্রেক্ষিত বিবেচনায় আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের অনুরোধ জানাব। সেগুলো হচ্ছে:

১) ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হতে হলে আমাদের প্রয়োজন ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ। আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনিয়োগবান্ধব বিদেশী বিনিয়োগের নিশ্চয়তা বাড়ানো। এ বিষয়ে আপনাদের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে;

২) আমরা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং আন্তঃসংযোগ বা কানেকটিভিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। জন-যোগাযোগ, বাণিজ্য বৃদ্ধি, পর্যটন উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হলে এর বিকল্প নেই;

৩) আপনারা জানেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা তুলে ধরেন।

বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, “স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক এটি আমার আন্তরিক প্রত্যাশা। দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বসবাস করার ক্ষেত্রে আমরা সকলের সাথে সহযোগিতা করবো ।” বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্য ছিল ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমার সরকার এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি নতুন মডেল প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ, বাণিজ্য, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জনযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলের শান্তি, প্রগতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় কূটনৈতিক প্রয়াস চালিয়ে একে অপরের তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে;

৪) অধিকতর বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশের পণ্যের জন্য নিত্য নতুন বাজারের সন্ধান করা;

৫) প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান এবং তাঁদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো ;

৬) আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ;

৭) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়সমূহ যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উগ্রবাদ, আন্তর্জাতিক অভিবাসন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দেশের স্বার্থ নিশ্চিত করা;

৮) খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৯) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সংঘাত পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের আওতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাত্রা ও পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা; এবং

১০) মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা।

আমার সরকারের কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও মঙ্গল নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যের সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এরফলে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয়, প্রগতিশীল এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে সকল লক্ষ্যের কথা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ

করেছি, তা পূরণের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কিন্তু আপনাদের তৎপরতা, কর্মদক্ষতা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করবে বলে আমি নিশ্চিত।

আমাদের সরকার জনগণের সরকার। জনগণের জীবনমান উন্নয়নে যে কোন কার্যক্রম গ্রহণে প্রস্তুত। একইসঙ্গে এ বিষয়ে অপেশাদারী মনোভাব ও ব্যর্থতার ব্যাপারে আমরা কোন ছাড় দেব না।

বিদেশে আপনারা একেকজন একেকটি বাংলাদেশ। আপনাদের কাজ নিছক চাকুরি করা নয়, আরও অনেক বড় এবং মহান কিছু। দেশের ১৬ কোটি মানুষের হয়ে আপনারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনারা। মনে রাখবেন, এদেশের সাধারণ গরিব মানুষ তাঁদের ট্যাক্সের পয়সায় বিদেশে সে দেশের উপযোগী করে আপনাদের জীবনযাপনের সুযোগ করে দিচ্ছেন। কাজেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সব সময় দেশের স্বার্থে আপনাদের কাজ করতে হবে।

যেসব দেশে আমাদের অধিক সংখ্যক প্রবাসী রয়েছেন, সেসব দেশে তাঁদের প্রতি আলাদা নজর দিতে হবে। তাঁরা যাতে কোনভাবেই হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের বিপদে-আপদে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই নেতিবাচক প্রচারণা হয়। উচ্চমানের পেশাদারিত্ব দিয়ে সেসবের মোকাবিলা করতে হবে। আর এজন্য নিজ দেশ, দেশের মানুষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ মানেই বন্যা, জলোচ্ছাস, হাড্ডিসার মানুষ- এটি এখন আর বাস্তবতা নয়। মনে রাখবেন এক দশক আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আমরা আর্থ-সামাজিক অনেক সূচকে প্রতিবেশী দেশ এমনকি উন্নত বিশ্ব থেকেও এগিয়ে গেছি। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণ- গোত্রের মানুষ শান্তিতে সহ-অবস্থান করে। উগ্রপন্থীরা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়েছিল। কিন্তু গোটা সমাজের উপর তার কোন প্রভাব পড়েনি। ইউরোপ-আমেরিকায় আজকাল অহরহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটছে। সে দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক বেশি সুরক্ষিত। আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন করেছি।

আপনারা যে যেখানেই আছেন, বাংলাদেশকে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন। স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সংবাদকর্মীদের সঙ্গে ঘনঘন মত বিনিময়ের আয়োজন করা যেতে পারে।

আমি জানি বিদেশে দূতাবাসে কাজ করতে প্রায়শই বিভিন্ন কারণে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। আমার সরকার বিদেশে দূতাবাসের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আপনারা জানেন, আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি কর্মচারিদের বেতন ভাতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছি। বৃদ্ধি করা হয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা। প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে হয় এদিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ১১৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১২টি দেশে নতুন দূতাবাস স্থাপনসহ নতুন ১৭টি মিশন খোলা হয়েছে। ২০১২ সালে বৈদেশিক ভাতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং সন্তানদের শিক্ষাভাতা বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষাভাতা প্রাপ্তির উর্ধ্বসীমা ২৩ বছর করা হয়েছে।

আমি আশা করি আপনারা আপনাদের মেধা, মনন ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান, ভাবমূর্তি ও সম্মান বিশ্বদরবারে আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।